বিল্‌স শ্রম সংবাদ

শ্রমিকদের মুখপত্র

আগস্ট ২০০৮

সম্পাদকীয়

শ্রমিকের মজুরি নিশ্চিত হলেই তৈরি পোশাক খাতে অস্থিরতা কমবে

পোশাক শিল্পে যে অস্থিরতা চলছে তার কারণ এখন সকলের কাছেই স্পষ্ট। শ্রমিকের বেতন ভাতা সময়মতো পরিশোধ না করে বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে সমস্যা ধামাচাপা দেওয়ার একটা কৌশল চলছে। আসলে সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে কি সমাধান লাভ করা সম্ভব? পোশাক শিল্প খাতটি আমাদের দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় খাত। বলতে গেলে দেশের অর্থনীতি যে ক'টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এর মধ্যে এটি অন্যতম। এ খাতটিকে রক্ষা করা এবং অধিকতর অগ্রগতির পথে ধাবিত করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থও নিহিত রয়েছে। অথচ বিগত কয়েক বছর ধরেই গার্মেন্ট সেক্টরের পরিবেশ ঘন-ঘন অস্থির হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে। এসব অস্থিরতার জন্য প্রায়ই আঙুল উঠছে অদৃশ্য কালো শক্তির দিকে। সে শক্তির উৎস বিদেশে এমন ধারণাও দেওয়া হয়। যদি কোনো অদৃশ্য কালো শক্তির হাত এখানে থেকেই থাকে, এমনকি যদি বাইরের হাত থাকে তবে তা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করতে হবে। নিজেদের দায়দায়িত্ব আড়াল করার জন্য যদি অদৃশ্য শক্তির প্রতি আঙুল তোলার অভ্যাস করা হয় তবে তা হবে মারাত্মক ভুল। আমরা মনে করি শিল্প ধ্বংস নয় শিল্প রক্ষার শক্তি শ্রমিকদের ভেতরেই রয়েছে। তারা কাজের বিনিময়ে চায় সময়মতো ন্যায্য মজুরি। এ ন্যায্যতার মাপকাঠিও দুবেলা দুমুঠো ভাত খাওয়ার নিশ্চয়তার সমান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতেই আমরা জানলাম ২০০৮ সালের প্রথম ছয় মাসে ৭২টি শ্রমিক বিক্ষোভ হয়েছে তার মধ্যে ৪১টি বিক্ষোভই ছিলো শ্রমিকের বেতন ভাতা বৃদ্ধি কিংবা বকেয়া বেতনের দাবিতে। শ্রমিকের মজুরি নিশ্চিত করলে তৈরি পোশাক খাতে সংকট কমে আসবে তা সুনিশ্চিত করেই বলা সম্ভব।

বিল্‌স-এর জরিপ প্রতিবেদন

তৈরি পোশাক শিল্পে ৬ মাসে ৭২টি শ্রমিক অসন্তোষ ৯৮৮ আহত ৪৫ গ্রেপ্তার ১০০০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা

২০০৮ সালের প্রথম ছয় মাসে সারা দেশে তৈরি পোশাক শিল্পে ছোট বড় ৭২টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে। বকেয়া বেতন-ভাতার দাবি, মজুরি বৃদ্ধির দাবিই ছিলো এসব আন্দোলনের অন্যতম কারণ। এসব আন্দোলন দমনের নামে পুলিশের লাঠিচার্য কিংবা শ্রমিক-পুলিশ বা শ্রমিক - মালিকপক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৯৮৮ জন শ্রমিক আহত হয়েছে, ৪৫ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং মামলা করা হয়েছে ১০ হাজারেরও বেশি শ্রমিকের বিরুদ্ধে। আন্দোলনের পর কারখানা থেকে চাকরিচ্যুত হয়েছে কমপক্ষে ৯৪ জন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন ভিত্তিক জরিপে এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে।

জরিপে দেখা গেছে, মোট শ্রমিক অসন্তোষের ৪১টিই সংঘঠিত হয়েছে বেতন ভাতা বৃদ্ধি ও বকেয়া আদায়ের দাবিতে। এছাড়া সহকর্মী কোনও শ্রমিককে হত্যা বা নির্যাতনের প্রতিবাদে শ্রমিক রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কমপক্ষে ১৩ বার। অন্যান্য যেসব কারণে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা গেছে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কারখানা লে-অফ ঘোষণা, বিনা নোটিশে ছাটাই, ছুটির দাবি কিংবা বোনাস বা টিফিনের দাবি।

বছরের শুরুতেই শ্রমিক অসন্তোষে রাজধানীর মিরপুর এলাকা অচল হয়ে পড়ে। কারখানার ভেতর একজন শ্রমিক হত্যার ঘটনায় রাস্তায় নামে মিরপুর পল্লবী এলাকার প্রায় সকল গার্মেন্ট শ্রমিক। এছাড়াও জানুয়ারি মাসে ঢাকা ও এর আসেপাশে কমপক্ষে ১৩ বার শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। ২য় পৃষ্ঠায়

সিলেটে বিল্স ও বিইআই'র যৌথ সেমিনারে অভিমত

উন্নয়নের জন্য উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ আরও বাড়াতে হবে

সিলেটে বিল্স-বিইআই'র যৌথ সেমিনারে বক্তারা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্স ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট - বিইআই এর যৌথ উদ্যোগে গত ১২ ও ১৩ জুলাই সিলেটে 'সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং সিলেটের অর্থনীতি' শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের প্রথম দিনে বক্তারা বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সিলেটে চোখে পড়ার মতো কোন বিনিয়োগ নেই। এ অঞ্চলে উৎপাদনশীল খাতে খুব সামান্যই বিনিয়োগ করা হয়েছে। প্রবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল ও দেশের সর্বোচ্চ ৬৪ ভাগ রেমিটেন্স সরবরাহকারী এলাকা হিসেবে সিলেট শীর্ষে থাকলেও এখানকার প্রবাসী ও বিত্তশালীদের টাকা ব্যাংকে অলস হয়ে পড়ে আছে। এই টাকা বিনিয়োগে তেমন কোন আগ্রহ কারো মাঝে নেই । এর ফলে এখানকার জনসাধারণ শিক্ষার হারের দিকে যেমন দেশের সর্বনিম্নে অবস্থান করছেন তেমনি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে তারা অন্য যে কোন অঞ্চল থেকে পিছিয়ে আছেন। বক্তারা বলেন, এ থেকে উত্তরণ প্রয়োজন । সিলেটের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এখাকার বিত্তবানতেদর অর্থ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগি উৎসাহিত করতে হবে এবং এ খাতে আরো বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তবেই এ অঞ্চল অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে বাড়বে কর্মসংস্থান। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. মোজাম্মেল হক। বিল্স এর চেয়ারম্যান মো. মজিবুর রহমান ভূঞা ও বিইআইএর পক্ষ থেকে এর কর্মকর্তা ও সাবেক শ্রম সচিব সৈয়দ সুজা উদ্দিন আহমেদ এবং সিলেট চেম্বার্স অব কমার্সের সিনিয়র সহসভাপতি জিয়াউল হক এসময় উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিলেট প্রেসকাবের প্রাক্তন সভাপতি ইকবাল সিদ্দিকী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেজ এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. নজরুল ইসলাম, ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরির সিবিএ'র প্রাক্তন সভাপতি আবদুল খালেক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক শাহাবুল হক, অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক শায়লা হক প্রমুখ। সেমিনারে 'সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বেসরকারি খাত উন্নয়ন এবং সিলেটের অর্থনীতি' শীর্ষক মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম। এছাড়া 'পাল্প এন্ড পেপার মিল্স সিলেট' শিরোনামে একটি কেসস্টাডিভিত্তিক পেপার উপস্থাপন করেন বিইআই'র কর্মকর্তা আফজাল কবীর খান। এছাড়াও সেমিনারে চা শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

বিল্স-এর জরিপ প্রতিবেদন

১ম পৃষ্ঠার পর

ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রমিক অসন্তোষের খবর পাওয়া যায় তিনটি, মার্চে ৭টি। এপ্রিলে এসে আবার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং এমাসে রাজধানী ও তার আসে পাশে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলন হয়। চট্টগ্রামেও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সারা মাসজুড়ে মোট ২২টি ছোট বড় আন্দোলন হয়। মে মাসে আন্দোলন হয় ১১টি এবং জুন মাসে ১৬টি।

এলাকা ভিত্তিতে দেখা গেছে মোট আন্দোলনের ৮টি ঘটেছে মিরপুর- পল্লবী - শেওড়াপাড়া এলাকায়, ১৬টি ঘটনা ঘটেছে ইপিজেডসহ সাভার - আশুলিয়া এলাকার বিভিন্ন গার্মেন্ট কারখানায়, গাজীপুর - কালিয়াকৈর - শ্রীপুর এলাকায় ঘটেছে ১৯টি ঘটনা, নারয়ানগঞ্জ - ফতুল্লা - রূপগঞ্জ এলাকায় ঘটে কমপক্ষে ১২টি ঘটনা, চট্টগ্রামে ঘটে ৬টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা এবং রামপুরা-বনানী এলাকায় ঘটে কমপক্ষে তিনটি ঘটনা। এছাড়াও কুমিল্লা, নরসিংদী ও রাজধানীর ডেমরা ও তেজগাঁওয়ে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। মিরপুর এলাকায় যেসব কারখানায় অসন্তোষ দেখা দেয় সেগুলো হচ্ছে- আউট ওয়্যার, আউট রাইট, আউট ফিট, এবিএম গার্মেন্ট, ওপেক্স গার্মেন্ট, এসকিউ গার্মেন্ট, আটলান্টিক গার্মেন্ট, প্রতীক গার্মেন্ট, ভারটেক্স গার্মেন্ট ও ইং মিং গার্মেন্ট।

সাভার এলাকায় ইউনিভার্স গার্মেন্ট, শাইন ফ্যাশন, পান্না টেক্সটাইল, মার্কস গার্মেন্ট, স্কোয়ার টেক্সটাইল, এক্সপেরিয়েন্স গার্মেন্ট, জেভিয়ান স্যুয়েটার, টেক্সলিটা গার্মেন্ট, সফটেক্স গার্মেন্ট, একেএইচ গ্রুপ, ঢাকা ডেইজিং, জিবি গার্মেন্ট, তাজ ফিউচার ডিজাইন, মেডলার এপারেলস, প্যাকরোকো গার্মেন্ট, শেড ফ্যাশন লি., পি এন্ড কিউ অ্যাটেয়ার্স, মির্জা নিটওয়্যার, এমজিএম নিট, হ্যান এন্ড জাটস, হলিউড ফ্যাশন ইত্যাদি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ হয়। গাজীপুর এলাকায় কারখানাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জোয়াং গ্লোবাল, জাহানারা স্পিনিং মিল, এফএস স্যুয়েটার, আশরাফ টেক্সটাইল, কটন কাব, মন্ডল গার্মেন্ট, নিডল ওয়েফ গার্মেন্ট, তানভীর ফ্যাশন, আলামিন ফেব্রিকস, অ্যাপেক্স উইভিং, কুলিয়ারচর স্যুয়েটার ফ্যাক্টরি, আরমা অ্যাপারেলস, সিল টেক্সটাইল, রোজ নিটিং ফ্যাক্টরি, পেনডোরা স্যুয়েটার ফ্যাক্টরি, ইউরেকা অ্যাপারেলস, প্রতীক স্যুয়েটার ও লা নভোটেক্স গার্মেন্ট।

নারায়নগঞ্জের মেট্রো গার্মেন্ট, লিবার্টি এন্ড মিত ওয়্যার গার্মেন্ট, জয়া গ্রুপ, নিট কটন কম্পোজিট, মাইক্রো ফাইবার, প্যাসিফিক স্যুয়েটার, ফুজি গার্মেন্ট, এনএস ক্রিয়েশনস, ওয়েস্টার্ন গার্মেন্ট, সোনারগাঁও গার্মেন্ট, ক্যামেন গার্মেন্ট, টাইম সুয়েটার ফ্যাক্টরি ইত্যাদি। চট্টগ্রামের প্রিমিয়াম স্টাইল গার্মেন্ট, চৌধুরী অ্যাপারেলস, আজিম গ্রুপ, অর্কিড স্যুয়েটার ও বিপিএল ফ্যাশনসহ আরো ৪০টি গার্মেন্ট কারখানা।

দুর্ঘটনা, শ্রমিকদের জীবন ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব : র‍্যাংগস ভবনের অভিজ্ঞতা

আলতাফ পারভেজ

র‍্যাংগস ভবনের ধ্বংসস্তূপ থেকে পাঁচ মাস পর উদ্ধার হলো কংকাল

দুর্ঘটনার দীর্ঘ ৫ মাস পর ২০০৮ সালের ১৫ মে বিধ্বস্ত র‍্যাংগস ভবন থেকে উদ্ধার হলো সিকিউরিটি গার্ড শহিদুল ইসলামের কংকাল। শহিদুল ইসলামের মৃতদেহ ভবনের মধ্যেই চাপা পড়ে ছিল ১৫০ দিনেরও বেশি। অথচ দুর্ঘটনার পর শহিদুলের পিতা রাজউকসহ সকলের কাছে ছেলের হদিস চেয়ে বারংবার ধর্ণা দিয়েছেন। উদ্ধার কাজ চলার সময় র‍্যাংগস ভবনের উদ্ধারকারীদের কাছে যেয়েও তিনি কান্নাকাটি করেছেন ছেলেকে উদ্ধার করে দেয়ার জন্য।

চাপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরের শহিদুল ইসলাম দুই বছর পূর্বে র‍্যাংগস গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান শিল্ড সিকিউরিটি কোম্পানিতে গার্ডের চাকুরি নেন। ভবনের নিচে আটকে পড়ে থাকলেও ঐ সিকিউরিটি কোম্পানি তার কর্মীকে উদ্ধারে ৫ মাসেও তৎপর হতে পারেনি। ১৫.১২.০৮ দৈনিক যুগান্তর

রাজউকের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী বিজয় সরণী থেকে তেজগাঁও শিল্প এলাকা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনা নেয়া হয় বহু আগে। র‍্যাংগস ভবনের কারণে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন হয়নি। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর র‍্যাংগস ভবন অপসারণ ও বিজয় সরণী থেকে তেজগাঁও শিল্প এলাকা পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনা আবার আলোচিত হতে থাকে।

২০০৭ সালের ২ আগস্ট সুপ্রীম কোর্ট বিজয় সরণীর সংযোগস্থলে অবস্থিত ১৮ তলা উচ্চতার র‍্যাংগস ভবনের নিচের ৬ তলাকে বৈধ এবং উপরের ১৪ তলাকে অবৈধ বলে রায় দেয়। এসময় সরকার ভবনটির বৈধ ৬ তলার জায়গাও অধিগ্রহণের চেষ্টা শুরু করে। এসময় অবৈধ ১৪ তলা অপসারণের কাজ হাতে নেয় রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)। প্রথমে নিজেরাই শ্রমিক নিয়োগ করে রাজউক ভাঙ্গার কাজ শুরু করে। পরে এ কাজের ঠিকাদারী দেয়া হয় 'সিক্সস্টার' নামক প্রতিষ্ঠানকে। সিক্সস্টার ২০০৭ সালের ৩ আগস্ট ভবন ভাঙ্গার কাজ শুরু করে। এ কাজে রাজউক নিরাপত্তামূলক কোন তদারকি না করায় এবং ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলগত জ্ঞানের অভাবে ৮ ডিসেম্বর রাতে র‍্যাংগস ভবনের উপরের কিছু অংশ ধসে পড়ে। পরবর্তী সময়ে এখান থেকে ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরে সিকিউরিটি গার্ড শহিদুলসহ ১২ জন মৃত শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন। সংবাদপত্রগুলোতে তখন উদ্ধার তৎপরতার দায়সারা ধরন সম্পর্কে বহু তথ্য প্রকাশিত হয়। যখন সরকারের ইচ্ছা হয়েছে উদ্ধার কাজ চলেছে– যখন ইচ্ছা হয়েছে বন্ধ করে দিয়েছে। এসময় সরকারের গণপূর্ত বিভাগ তথা রাজউকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। র‍্যাংগস ভবন ভাঙ্গা ও দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী আমাদের দেশে শ্রমজীবীদের পেশাগত নিরাপত্তাহীনতার এক বর্বরতম দৃষ্টান্ত।

ডেট লাইট বিজয় সরণী : দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিক হলে উদ্ধার অভিযান যেভাবে শুরু হয়

র‍্যাংগস ভবনের অবস্থান বাংলাদেশের সবচেয়ে 'নিরাপদ জোন-এ'। এই ভবনের পাশেই দেশের নির্বাহী প্রধানের কার্যালয়। ভবনের পার্শ্ববর্তী সড়কটি 'ভিভিআইপি' সড়ক হিসেবে পরিচিত। ভবন থেকে কয়েক শত গজ দূরেই ঢাকা ক্যান্টমেন্ট এবং ভবনের চারিদিকে ৫-১০ মিনিটের গাড়ি-দূরত্বে দেশের অনেকগুলো বৃহৎ ফায়ার কন্ট্রোল ব্রিগেডের অবস্থান। তারপরও ৮ ডিসেম্বর র‍্যাংগস ভবন ভেঙ্গে পড়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধার কাজ শুরু করা যায়নি এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী তিন ঘন্টায় মাত্র একজন নিহত শ্রমিককে উদ্ধার করা গেছে। শেষ রাতেও উদ্ধারকারী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা বলছিলেন, ভেতরে কোন শ্রমিক আটকে নেই। (দেখুন, যুগান্তর ০৯.০৫.০৮)। অথচ সেখান থেকেই পরে একের পর এক লাশ বের হয়েছে। ৮ ডিসেম্বরের দুর্ঘটনার আগেও র‍্যাংগস ভবন ভাঙ্গার কাজ করতে যেয়ে এক শ্রমিক পড়ে মারা গিয়েছিল।

শ্রমিকের জীবন ও মালিকের দায়িত্বশীলতা : দুর্ঘটনার আগে

১. রাজউক যখন সিক্সস্টার নামক কোম্পানিকে ভবনটি ভাঙ্গার কাজ দেয়– তখন কথা ছিল মাত্র তিন মাসের মধ্যে কাজটি সমাপ্ত হবে। কিন্তু এই রিপোর্ট লেখার সময় প্রায় দিগুন সময় পরও দেখা গেছে ভাঙ্গার চলছে। যত জন শ্রমিক দিয়ে তিন মাসে কাজটি করানো যেত তার চেয়ে কম শ্রমিক ব্যবহার করে, স্বল্প শ্রমিককে অধিক খাটানোর কারণেই বিলম্ব ঘটে।

২. ভাঙ্গার দায়িত্ব প্রাপ্ত সিক্সস্টার নামক কোম্পানি কাজ পেয়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে সাব কন্ট্রাক্ট দেয়। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। যে যেভাবে পারে ভবনের বিভিন্ন অংশ ভাঙ্গছিল। উপরের কয়েকটি ফ্লোর ভাঙ্গা শেষ না করেই মাঝখানের ফ্লোর ভাঙ্গা শুরু করায় ৮ ডিসেম্বরের দুর্ঘটনা ঘটে। ভাঙ্গার পর রাবিসগুলো নিচে না ফেলে বিভিন্ন ফ্লোরেই জমা করে রাখা হচ্ছিলো। সাব কন্ট্রাক্টররা শ্রমিকদের শর্ত দিয়েছিল সাংবাদিকদের সঙ্গে কোন কথা বলা যাবে না।

র‍্যাংগস ভবনের অভিজ্ঞতা

৩. ভবন ভাঙ্গার কাজ চলা অবস্থায় ৩-৪ শত শ্রমিক নিয়মিত সেখানে কাজ করতেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সেখানে ছিল না।

শ্রমিকের জীবন ও মালিকের দায়িত্বশীলতা : দুর্ঘটনার পরে

১. দুর্ঘটনার পরই নিচের ছয় তলার সিকিউরিটি গার্ডরা বিল্ডিংয়ের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দেয়! ফায়ার সার্ভিসকে সেই তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়।

২. দুর্ঘটনার শুরুতে বিভিন্ন ফ্লোরের অনেক শ্রমিক ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখে মনে করেছিল আগুন লেগেছে। যে কারণে কেউ কেউ লাফিয়ে পড়ে আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী ট্রাফিক সার্জেন্ট কামরুল হাসান জানান এরকম আহত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩০-৩৫ জন। বিপদের সময় নেমে আসার মত কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি ভবন ভাঙ্গার পরিকল্পনায়।

৩. ৮ ডিসেম্বর রাতে ফায়ার সার্ভিস ভবনটি উদ্ধার তৎপরতার জন্য 'ঝুঁকিপূর্ণ' অভিহিত করে কাজ বন্ধ করে দেয়। অথচ এই সময় অনেক নিহত শ্রমিকের লাশ ঝুলছিলো। উদ্ধার তৎপরতার বন্ধ করে দেয়ার পর সাধারণ শ্রমিকরা ভেতরে যেয়ে ফ্লোরে ফ্লোরে পরিচিতদের লাশ খুঁজতে থাকে। এসময় কংক্রিটে চাপা পড়ে থাকা মৃত দেহ দেখতে পায় তারা। (বিস্তারিত দেখুন, ১০.১২.০৭ ইত্তেফাক)। শ্রমিকরা এসময় বলছিল, তাদের অন্তত ১৪ জন সহকর্মী নিখোঁজ। এসব শ্রমিকদের আত্মীয়-স্বজন ভবনের সামনে কান্না-কাটি করছিলেন। এদিনটি ছিল আবার বিশ্ব মানবাধিকার দিবস!

৪. দুর্ঘটনার পর কয়েক ঘন্টা উদ্ধার তৎপরতা চালিয়ে ফায়ার সার্ভিস ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করে এবং রাজউক ও বুয়েটের বিশেষজ্ঞরাও জানান, ভবনটি যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। 'ঝুঁকি'র কথা বলে এভাবে দুর্ঘটনা কবলিত মানুষকে উদ্ধার স্থগিত রাখার দৃষ্টান্ত সম্ভবত বিশ্বে বিরল। সেই ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ২০০৮ সালের আগস্টেও ভেঙ্গে পড়েনি। আসলে শ্রমিকরা মরে পড়েছিল বলেই উদ্ধার কাজে এই গাফিলতি করা হয়।

৫. দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে যখন লাশের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে তখন এক পর্যায়ে রাজউক মৃত শ্রমিকদের জন্য এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দেয়। কী নিয়মের ভিত্তিতে এই ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে এবং টাকার অংক কেন এক লাখ, কেন তার কম-বেশি নয় সেটা এক বড় প্রশ্ন ছিল। র‍্যাংগস ভবন ভাঙ্গার শুরুতে সোহরাব নাম একজন শ্রমিক মারা গিয়েছিল। তার পরিবারকেও এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলে ২৫ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। [দেখুন, ১৩.১২.০৭ যায় যায় দিন]। দৈনিক সংবাদের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় [১৯.১২.০৮] দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া ৪ শ্রমিককে তাদের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের মধুখালীতে ক্ষতিপূরণ দেয়া হলেও একই উপজেলার অন্য ৬ জন নিহত শ্রমিকের পরিবার কোন ক্ষতিপূরন পায়নি। মধুখালীর কয়েকটি পরিবার বলেছে র‍্যাংগস ভবন ভাঙ্গার কাজে যুক্ত তাদের পরিবারের সদস্যদের লাশও তারা পায়নি তখনো এবং এসব মানুষ জীবিত আছে কি না সেটাও তাদের জানায়নি কেউ।

৬. প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের মাত্র ৫ মিনিটের পায়ে হাটা দূরত্বে হলেও প্রধান উপদেষ্টা বা অন্য কোন উপদেষ্টা দুর্ঘটনার শিকার শ্রমিকদের দেখতে আসেননি। গণপূর্ত উপদেষ্টার দুর্ঘটনা সম্পর্কে যে মন্তব্যটি পাওয়া গেছে তা হলো-'ভবনটি মাঝখান থেকে ভেঙ্গে পড়া এক অদ্ভুত ব্যাপার' [সমকাল, ১০ ডিসেম্বর ২০০৭]।

৭. দিনের পর দিন যখন পত্রিকায় এ মর্মে সংবাদ ও ছবি প্রকাশিত হয়েছে, র‍্যাংগস ভবনে লাশ ঝুলছে এবং তারপরও যখন সেই লাশ উদ্ধার করার কাউকে পাওয়া যাচ্ছিলো না তখন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ [বিচারপতি খায়রুল হক ও বিচারপতি আবদুল আওয়াল] লাশ অপসারণ ও সমাধিস্থ করার জন্য সরকারের বিভিন্ন কর্তাব্যক্তির উদ্দেশ্যে রুল জারি করেন। এটা এক অভাবনীয় ঘটনা এবং অবশ্যই উচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল দৃষ্টান্ত। এই ট্রাজেডির ঘটনায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সিক্সস্টার এবং র‍্যাংগস ভবনের মালিকের বিরুদ্ধে কর্তব্য অবহেলা অভিযোগে অপর একটি মামলা হয়েছে ঢাকা মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে। জনৈক আইনজীবী মাহবুবুল আলম দুলাল এই মামলাটি করেছেন।

এই ঘটনায় মুখ্য ভূমিকা যে প্রতিষ্ঠানের সেই রাজউকের প্রকৌশলী বা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন তরফ থেকে কোন মামলা করা হয়নি বা অভিযোগের মুখে পড়তে হয়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে [৪ নং অধ্যায়] ভবন ভাঙ্গার যেসব নিয়ম কানুনের কথা রয়েছে সরকারি প্রতিষ্ঠান হয়েও রাজউক কিছুই তার অনুসরণ করেনি। ভাঙ্গার পূর্বে একটি ভবন সম্পর্কে বিস্তারিত প্রকৌশলগত সার্ভের নিয়ম পুরোপুরি অবজ্ঞা করা হয় এক্ষেত্রে। ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে ভবন ভাঙ্গার সময় শ্রমিকদের নিরাপত্তায় করণীয় সম্পর্কেও বিস্তারিত নির্দেশিকা রয়েছে। তা অনুসরণ করা হয়নি এক্ষেত্রে। রাজউক এই ঘটনার তদন্তে প্রধান প্রকৌশলী শাহ আলমের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই তদন্তের ফলাফল কিছুই জনসম্মুখে জানানো হয়নি। যদিও পরবর্তীকালে রাজউক এই ঘটনায় 'দায়িত্বে অবহেলা'র কারণে তার একজন প্রকৌশলীকে বরখাস্ত করে।

দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে যখন লাশের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে তখন এক পর্যায়ে রাজউক মৃত শ্রমিকদের জন্য এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা দেয়। কী নিয়মের ভিত্তিতে এই ক্ষতিপূরণ দেয়া হচ্ছে এবং টাকার অংক কেন এক লাখ, কেন তার কম-বেশি নয় সেটা এক বড় প্রশ্ন ছিল।

র‍্যাংগস ভবনের অভিজ্ঞতা

তদন্ত কমিটি গঠনকালে এ সম্পর্কিত হাইকোর্টের নির্দেশনাও লংঘন করা হয়। হাইকোর্ট বলেছিল, র‍্যাংগস ভবনের উদ্ধার কাছে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং তাতে রাজউকের কেউ থাকতে পারবে না। ১৩ ডিসেম্বর হাইকোর্ট এই রুল জারি করেছিল। পরবর্তীকালে দৈনিক ইত্তেফাকের এক রিপোর্টে [১০.১২.০৮] রাজউকের তদন্ত কমিটির সূত্রে বলা হয়, তারা মনে করছে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এটা বলাই সবচেয়ে 'যুক্তিসঙ্গত'!

র‍্যাংগস্ ভবন দুর্ঘটনা একটি মুনষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ। এই দুর্ঘটনা পরবর্তী ঘটনাবলীতে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার করুণচিত্র ফুটে উঠেছে। মাত্র একটি ভবন ভাঙ্গার কাজে সরকারের মাসের পর মাস লেগেছে। ভবনের কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়ার পর তা সরিয়ে আহত-নিহতদের উদ্ধার করার মত সাধারণ যন্ত্রপাতিও সরকারের পূর্ত বিভাগের হাতে নেই। অথচ এসব প্রতিষ্ঠানের পেছনে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যয় হচ্ছে। এমনকি দুর্ঘটনার পর সরকারের নীতিনির্ধারক কর্তা ব্যক্তিরা কেউ দুর্ঘটনাস্থলে যেয়ে পরিস্থিতি বোঝারও চেষ্টা করেননি। ঘটনা থেকে কোন শিক্ষা নিতেও রাষ্ট্র পরিচালকরা অপারগ।

পূর্ত কাজের পুরোহিত রাজউকের দায়িত্বশীলতা : র‍্যাংগস ভবন যে শিক্ষা রেখে গেল

ঢাকার ভিআইপিদের চলাচলের একটি রাস্তার পাশে ১৮ তলা ভবন ভাঙ্গার কাজ চলা অবস্থায় কেবল কাঁচ পড়ে বিভিন্ন সময় বহু মানুষ আহত হয়েছে। এমনকি যেদিন র‍্যাংগস ভবনের কয়েক তলা ধসে পড়ে সেদিনও রাস্তায় কাঁচের আঘাতে বহু মানুষ আহত হয়। রাত ১০ টার পরিবর্তে দিনে এই দুর্ঘটনা ঘটলে আরো বহু মানুষ আহত হতো। ভবন ভাঙ্গার শুরুতে চারিদিকে চটের কাপড় ঝুলিয়ে দেয়ার মত সাধারণ নিরাপত্তামূলক কাজটিও করেনি রাজউক। এমনকি দুর্ঘটনার সময় ভবনের বেজমেন্টে অনেক গাড়ি পাকিং অবস্থায়ও ছিল। র‍্যাংগস ভবনের ভাঙ্গন প্রক্রিয়া এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী রাজউকের কার্যক্রম দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ বিষয়ে তাদের কোন পূর্ব প্রস্তুতি, সতর্কতা কিছু ছিল না। দুর্ঘটনার পর তারা দফায় দফায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। কিন্তু ভাঙ্গার পূর্বে কাজের কৌশল নির্ধারণের জন্য কোন কমিটি করেনি। ২০০৭ সালের ২ আগস্ট সুপ্রীম কোর্ট র‍্যাংগস ভবনকে অবৈধ বলে রায় দেয়। আর ৩ আগস্টই ভবনটি ভাঙ্গার কাজ শুরু করে দেয় রাজউক। একটি দিনও তারা প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা করেনি। সরকার তখন এই ভবন ভাঙ্গার কাজ শুরু করে চমক সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের ব্যর্থতার ব্যাপকতাই চমক সৃষ্টি করেছে। প্রথমে নিজেরা ভাঙ্গার কাজে ব্যর্থ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজউক যাদের এই দায়িত্বের ঠিকাদারী দেয় তাদেরও ভবন ভাঙ্গার কোন পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল না। তারা অভিজ্ঞ জাহাজ ভাঙ্গায়। রাজউককে ৭০ লাখ টাকা দিয়ে ভবনের সব উপকরণ নিয়ে নেবে এই চুক্তিতে কাজ পেয়ে কয়েকজন শ্রমিককে হাতুড়ি শাবল, আর কয়েকটি ইলেকট্রিক কাটার ধরিয়ে দিয়ে মূল ঠিকাদার সরে পড়ে। বলা যায়, পুরো প্রক্রিয়ায় প্রকৌশলগত কোন তদারকি ছিল না। যদিও দুর্ঘটনার পর র‍্যাংগস ভবন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য এক আকর্ষণীয় গবেষণাগার হয়ে উঠেছে। অথচ নিখোঁজ শ্রমিকদের আত্মীয়-স্বজন যখন দেশের দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছিলো তখন তাদের সামান্য তথ্য দেয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পুরো সময় জুড়ে রাজউক কোন ধরনের ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা করেনি। দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা এবং জবাবদিহিতার উর্ধ্বে থাকার লক্ষ্যেই এটা ঘটেছে। অথচ কার্যকালে ঐ সময়ের গণপূর্ত উপদেষ্টাকে দেখা গেছে কারণে-অকারণে বহু বিষয়ে নিয়মিত মিডিয়া ব্রিফিং দিতে।

জীবিত অবস্থায় র‍্যাংগস ভবন ছিল রাজউকের দুর্নীতির এক স্মারক স্তম্ভ। কারণ তাদের সহায়তা ছাড়া ভিভিআইপি রোডে এই অবৈধ নির্মাণ সম্ভব ছিল না। আর মৃত র‍্যাংগস ভবনের জন্য জীবনদানকারী শ্রমিকদের কারণেও রাজউক পেশাগত নিরাপত্তাহীনতার এক বর্বর অধ্যায়ের অংশীদার হয়ে থাকলো। এমনকি দুর্ঘটনার পর শ্রমিকরা যখন অভিযোগ করছিলো, ঈদের সময় এক সঙ্গে দেয়ার কথা বলে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'সিক্সস্টার' তাদের প্রচুর টাকা বকেয়া রেখেছে এবং নিহত শ্রমিকদেরও হাজার হাজার টাকা এভাবে বকেয়া পড়ে ছিল। রাজউক সেই টাকা আদায় করে দেয়ার জন্য কোন ভূমিকা রাখেনি।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলতা: সংবাদপত্রভিত্তিক নমুনা বিশ্লেষণ

ভাঙ্গনের শিকার হলেও র‍্যাংগস ভবন ইতিমধ্যে তারকা খ্যাতি পেয়েছে। বলা যায় মৃত্যুর পূর্বেই এই ভবন অমরত্ব পেয়েছে। নিচে আমরা র‍্যাংগস ভবন দুর্ঘটনা পরবর্তী সংবাদ শিরোনামের সময়ভিত্তিক ধারাবাহিকতার একটি চিত্র তুলে ধরবো। যা

জীবিত অবস্থায় র‍্যাংগস ভবন ছিল রাজউকের দুর্নীতির এক স্মারক স্তম্ভ। কারণ তাদের সহায়তা ছাড়া ভিভিআইপি রোডে এই অবৈধ নির্মাণ সম্ভব ছিল না। আর মৃত র‍্যাংগস ভবনের জন্য জীবনদানকারী শ্রমিকদের কারণেও রাজউক পেশাগত নিরাপত্তাহীনতার এক বর্বর অধ্যায়ের অংশীদার হয়ে থাকলো। এমনকি দুর্ঘটনার পর শ্রমিকরা যখন অভিযোগ করছিলো, ঈদের সময় এক সঙ্গে দেয়ার কথা বলে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান 'সিক্সস্টার' তাদের প্রচুর টাকা বকেয়া রেখেছে এবং নিহত শ্রমিকদেরও হাজার হাজার টাকা এভাবে বকেয়া পড়ে ছিল। রাজউক সেই টাকা আদায় করে দেয়ার জন্য কোন ভূমিকা রাখেনি।

র‍্যাংগস ভবনের অভিজ্ঞতা

থেকে কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলতার ধারাবাহিকতা পাঠক বুঝতে পারবেন।

১০.১২.০৭ : র‍্যাংগস ভবনে তিন শ্রমিকের লাশ ঝুলছে, উদ্ধার কাজ স্থগিত; প্রথম আলো।

১১.১২.০৮ : র‍্যাংগস ভবনের ধ্বংসস্তুপে লাশ পচা গন্ধ, উদ্ধার অভিযানের প্রস্তুতি চলছে; ভোরের কাগজ।

১২.১২.০৮ : আজ র‍্যাংগস ভবনে উদ্ধার কাজ শুরু হতে পারে; যায় যায় দিন।

আমাদের সময়

ধ্বংসস্তূপে লাশ রেখেই উদ্ধার কাজ বন্ধ

র‍্যাংগস ভবন থেকে মৃতদেহ গায়েবের অভিযোগ করলেন স্বজনরা

রেজোয়ান বিশ্বাস: বিধস্ত র‍্যাংগস ভবন থেকে লাশের তীব্র গন্ধ বের হলেও গতকাল একটি লাশও উদ্ধার হয়নি। এ অবস্থায় গতকাল উদ্ধার কাজ বন্ধ ঘোষণা করেছে ফায়ার সার্ভিস ও রাজউকের উদ্ধারকারী দল। তারা বলছেন, ধ্বংসস্তূপের নিচে লাশ গায়েব করা হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও কমপক্ষে ৮টি লাশ চাপা পড়ে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বাবা, ভাই ও ছেলের লাশ উদ্ধার করা না হবে তারা ঘরে ফিরবেন না। এমনকি গত বৃহস্পতিবার উদ্ধারকৃত লাশও গ্রহণ করবে না তারা। এ

১৫.১২.০৮ : চার তলায় লাশের গন্ধ; ঝিমিয়ে পড়েছে উদ্ধার কাজ; সংবাদ।

১৭.১২.০৮ : নয় দিন পরেও ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে আছে শ্রমিক লাশ; প্রথম আলো।

১৮.১২.০৮ : র‍্যাংগস ভবন থেকে আরো ৫টি লাশ উদ্ধার; ইত্তেফাক।

১৯.১২.০৮ : র‍্যাংগস ভবন থেকে আরো ১টি লাশ উদ্ধার; সংবাদ।

১৫.০৫.০৮ [প্রায় ৫ মাস পর]: র‍্যাংগস ভবন থেকে ১টি কংকাল উদ্ধার; যুগান্তর।

উপরোক্ত টাইম লাইন স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে র‍্যাংগস ভবন দুর্ঘটনায় মৃতদের দ্রুত উদ্ধার করা সম্ভব ছিল এবং ঝুঁকির কথিত বিষয়টি আসলে উদ্ধার তৎপরতা দীর্ঘায়িত করার অজুহাত ছিল মাত্র।

র‍্যাংগস ভবন দুর্ঘটনা : সিভিল সমাজের নিরবতা

ঢাকায় বড় কোন গাছ কাটার সময়ও এখন প্রতিবাদ ওঠে। এটা ভালো লক্ষণ। দায়িত্বশীল একটা নাগরিক সমাজ তৈরি হয়েছে এ শহরে। কিন্তু র‍্যাংগস ভবন দুর্ঘটনার পর তিলে তিলে যেভাবে শ্রমিকদের হত্যা করা হলো এবং যেভাবে ভিভিআইপি রোডে দিনের পর দিন লাশের প্রদর্শনী চললো তাতে এখানকার নাগরিক সমাজে কোন প্রতিবাদ দেখা গেল না। সেরকম হলে হয়তো শ্রমিক পরিবারগুলোর জন্য পরিস্থিতি এত শোকাবহ হতো না।

র‍্যাংগস ভবন নিয়ে মামলা চলাকালে উচ্চআদালত একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে সত্যি কতো কিছু ঘটে।' ঢাকার এমন ব্যস্ত সড়কে কীভাবে এমন সুবিশাল অট্টালিকা অবৈধভাবে নির্মাণ হলো সে বিষয়ে কৌতুক করে এই মন্তব্য করেছিলেন আদালত।

কিন্তু রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের চোখের সামনে শ্রমিকদের এরকম প্রতিকারহীন নির্বিচার মৃত্যুর মিছিল দেখে মনে হয়েছে 'স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে এমন বর্বরতাও ঘটে?'

র‍্যাংগস ভবন দুর্ঘটনা : যেভাবে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যেত

– ভাঙ্গার কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন প্রকৌশলীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি প্রয়োজন ছিল;

– ভাঙ্গার পর ভগ্নস্তুপগুলো নিয়মিত সরিয়ে ফেলা যেত;

– রাজউক যাদের ভাঙ্গার ঠিকাদারী দিয়েছে তাদের এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আছে কি না তা সহজেই যাচাই করা যেত;

– কাজের সময় শ্রমিকদের সেফটি বেল্ট, মাথায় হেলমেট সরবরাহ করা যেত, যা হয়নি;

– দুর্ঘটনার পর জানা গেছে, দুর্ঘটনাকারে এক দল শ্রমিক ভবনের নিচে ঘুমাচ্ছিলো। যে ভবন দিনে-রাতে দুই শিফটে ভাঙ্গা হচ্ছে তার ভেতরে শ্রমিকদের ঘুমাতে দিয়েছে কারা?

– হেভি কংক্রিট ভাঙ্গার কাজে আর কতকাল আমরা হাতুড়ি শাবল ব্যবহার করবো? দেখা গেছে দুর্ঘটনার পরও বাড়তি শ্রমিক বা উন্নত কোন যন্ত্রপাতি দিয়ে বড় বড় কংক্রিট স্ট্রাকচার সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে না। ফলে অযথাই দিনের পর দিন সময় ব্যয় হয়েছে।

– র‍্যাংগস ভবন দুর্ঘটনায় শ্রমিকদের লাশ কয়েক মাস পরও উদ্ধার হয়েছে। এটা যদি সচিবালয়ের কোন ভবন হতো কিংবা নিকটবর্তী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের কোন বিল্ডিং হতো– তা হলে কি সরকার লাশের এই লাইভ শো দেখাতে পারতো?

নারী শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প

নারী শ্রমিকের জন্য অভিন্ন দাবিসনদ প্রণয়ণে কাজ করছে বিল্‌স

নারী শ্রমিকের জন্য একটি অভিন্ন ন্যূনতম দাবিসনদ প্রণয়নের লক্ষ্যে বিল্‌স- নারী শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্পের আইওতায় ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জুলাইয়ে এ কর্মসূচীর আওতায় দুটি নেটওয়ার্কিং সভা দুটি পরামর্শ সভা ও বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত নারীদের সাথে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নপত্রপূরণ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলে।

নেটওয়াকিং ও পরামর্শ সভা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে প্রথম নেটওয়ার্কিং সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ জুলাই ২০০৮ তারিখে। সভায় ১৩ জন প্রাথমিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। পরে ৩১ জুলাই ১৭ জন প্রাথমিক শিক্ষকের অংশগ্রহণে একটি পরামর্শ সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ৩০ জুলাই ২০০৮ তারিখে বিভিন্ন এনজিওতে কাজ করেন এমন ১৭জন নারী এনজিও কর্মীদের সাথে আরেকটি পরামর্শ সভা পরিচালিত হয়। সভাসমূহ পরিচালনা করেন সিডব্লিউসিএস এর প্রেসিডেন্ট এবং অভিন্ন সনদ প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কনসালট্যান্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ইসরাত শামীম। এসব নেটওয়ার্কিং সভা ও পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারীরা তাদেও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নারীদের যেসব সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং সেসব সমস্যা সমাধানে করণীয় কি হতে পারে সেদিকে আলোকপাত করেন। উভয় আলোচনা থেকে কতিপয় সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

ক্যাম্পেইন টিমের তথ্য ও কেসস্টাডি সংগ্রহ : কর্মক্ষেত্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় একটি অভিন্ন জাতীয় সনদ তৈরি এবং বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও সেক্টর পর্যায়ে ব্যাপক ক্যাম্পেইন ও অ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টরে তথ্য ও কেসস্টাডি সংগ্রহেরও কাজ চলছে। বিল্‌স এর সহযোগী জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনসমূহের নারী কর্মীরা এসব তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেন। প্রতি দুইজনের টিম বিভিন্ন সেক্টরে কেসস্টাডি ও তথ্য সংগ্রহ করেন। যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তারা হচ্ছেন- আইনজীবী, হোটেল শ্রমিক, নার্স, চাতাল শ্রমিক, পাটকল শ্রমিক, এনজিও কর্মী, গৃহকর্মী, হকার, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার কর্মী, ব্যাংক কর্মী, শিক্ষক, নির্মাণ শ্রমিক, টিএন্ডটি কর্মী, বিউটি পার্লার কর্মী, হকার নারী শ্রমিক, দর্জি শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, শিক্ষক ও সংবাদমাধ্যম কর্মী। এসব আলোচনা ও কেসস্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশের ভিত্তিতেই একক দাবি সনদ প্রণয়ন করা হবে।

নারী পেশাজীবীদের সাথে একটি পরামর্শ সভায় উপস্থিতদের একাংশ

দিনাজপুরে চাতাল শ্রমিকদের সংগঠিতকরণে ট্রেড ইউনিয়ন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

চাতাল সেক্টরে কর্মরত অসংগঠিত শ্রমিকদের সংগঠিতকরণে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিল্‌স এলও-এফটিএফ প্রকল্পের আওতায় চারদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গত ১৯ থেকে ২২ জুলাই দিনাজপুরের বাঁশের হাট এলাকায় ব্রাকের ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার (টার্ক) এ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের ১৪ জন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশ নেন। এদেও মধ্যে ৭ জন নারী ও ৭ জন পুরুষ।
চাতাল শিল্পের বাস্তব চিত্র নিয়ে বিল্‌স পরিচালিত গবেষণার ফলাফল তুলে ধরার মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়। অংশগ্রহণকারীরা উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করেন। চাতাল শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাও এ আলোচনায় অংশ নেন। প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে চাতাল শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় শ্রম আইন ২০০৬ এর কার্যকারিতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা হয়। পরে দ্বিতীয় দিনে চাতাল শ্রমিকদের সংগঠিতকরণে আইনি ও অন্যান্য বাধা চিহ্নিত করে সেসব উত্তরণে করণীয় এবং ইউনিয়ন সে লক্ষ্যে কি ভূমিকা পালন করতে পারে সেদিকে আলোকপাত করা হয়। দলগত কাজের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়নের করণীয় দিকগুলো চিহ্নিত করে পরে তা যৌথ আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রহণ করা হয়। চাতাল শ্রমিকের প্রতিনিধি ও জাতীয় ফেডারেশনের প্রতিনিধি গণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণে চাতাল শ্রমিকদের সংগঠিতকরণে প্রচার কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রণয়নের ওপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সবশেষে অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ উদ্যোগে দুই দিনের করে একেকটি ফলোআপ কর্মসূচীর পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়।

দিনাজপুরে প্রশিক্ষণচলাকালে একটি দলীয় কাজ চলছে

প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন বিল্‌স এর প্রোগ্রাম অফিসার আবু ইফসুফ মোল্লা। বিভিন্ন অধিবেশন পরিচালনা করেন প্রশিক্ষক দলের সদস্য সামছুন্নাহার ভূঁইয়া, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশ এর দিনাজপুর কমিটির সভাপতি রবিউল আউয়াল খান, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন এর দিনাজপুর শাখার সাধারন সম্পাদক মজিবুর রহমান ও সভাপতি সাইফুল ইসলাম।

ডিসেন্ট ওয়ার্ক: সামাজিক অগ্রগতির মূলেই যার অবস্থান

মাহমুদ মেনন

"আইএলও'র প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে সকল নারী ও পুরুষের জন্য স্বাধীনতা, সমতা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদাবোধ রয়েছে এমন শোভন ও উৎপাদনশীল কাজ নিশ্চিত করা।"- *হুয়ান সোমাভিয়া, আইএলও মহাপরিচালক*

কর্মসংস্থানের দিক থেকে এই শোভন কাজ বা ডিসেন্ট ওয়ার্কের নির্ণয়ক (ইন্ডিকেটর) সমূহ হচ্ছে:

১. কর্মসংস্থানের সুযোগ

এটি মর্যাদাকর কাজের প্রধান শর্ত। মোট শ্রম শক্তির অংশগ্রহণ হার, মোট জনসংখ্যার মধ্যে কর্মসংস্থানের হার, বেকারত্বের হার এ বিষয়গুলো এক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য।

২. পর্যাপ্ত মজুরির কর্মসংস্থান

মর্যাদাকর কাজের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক তার কাজ করে যথাযথ ও পর্যাপ্ত মজুরি পাচ্ছে সেটি শোভন কাজের অন্যতম আরেকটি শর্ত। কাজের সুযোগ নিশ্চিত করতেও এটি একটি উপকরণ হিসেবে কাজ করে। তবে এ হার কত হবে সেটি সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। একটি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিবেচনায় তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

৩. কাজের পরিবেশ

কাজের পরিবেশ মর্যাদাকর কাজের তৃতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি নির্ণয়ক। এর আওতায় আসতে পারে রাত্রীকালীন কাজ, কর্মঘন্টা, সাপ্তাহিক বিশ্রাম ও স্ববেতন ছুটি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি।

মর্যাদাকর শোভন কাজ আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও দেশসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কতিপয় অগ্রাধিকারভিত্তিক এজেন্ডাকে নির্দেশ করে। এগুলো হচ্ছে-

১. একটি গ্রহণযোগ্য বিশ্বায়ন: শ্রমিকদের অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক খাতে ঠেলে দেওয়া ও ব্যাপক অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করার পাশাপাশি বিশ্বায়ন শ্রমিকের মর্যাদাকর শোভন কাজের পক্ষে ভূমিকা রাখতে পারে।

২. দারিদ্র বিমোচন: কাজের সুযোগ সৃষ্টির সাথে দারিদ্র বিমোচন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। দারিদ্র বিমোচনে মর্যাদাকর কাজ ভূমিকা রাখতে পারে। আইএলও'র বক্তব্য হচ্ছে- 'এক স্থানে দারিদ্র সকল স্থানের জন্যেই অগ্রগতির ক্ষেত্রে হুমকি স্বরূপ'।

৩. নিরাপত্তা: কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিশ্ব শান্তি স্থাপনেও ভূমিকা রাখে। স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও বৈশ্বিক সকল পর্যায়ে এ নিরাপত্তা জরুরি।

৪. সামাজিক অন্তর্ভূক্তি: সমান সুযোগ লাভ এবং কর্মসংস্থানে সকল বৈষম্যের অবসান মানুষকে তার যোগ্যতার সবটুকু ঢেলে দিয়ে কাজ করার আগ্রহ যোগায়।

৫. মর্যাদা: শ্রম কোন পণ্য নয়। শ্রমের মূল্য প্রদান করা হলে তা মানুষকে মর্যাদাকর পারিবারিক জীবন যাপনের সুযোগ করে দেয়।

মর্যাদাকর শোভন কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করার পথে প্রধান ঘাটতিসমূহ:

১. বিশ্বের অর্ধেক শ্রমিকই তাদের দৈনিক আয় দুই ডলারের বেশি উঠাতে পারছে না।

২. বিশ্বের অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানে মান ও পরিমানগত উভয় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য থেকে যাচ্ছে। নারীরা অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে বেশি খাটছে যেখানে সামাজিক সুরক্ষা অপেক্ষাকৃত কম এবং উচ্চমাত্রায় নিরাপত্তাহীনতা বর্তমান।

৩. বিশ্বে প্রায় ৯ কোটি বেকার যুবক রয়েছে যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৪। যা বিশ্বের মোট বেকারত্বের অর্ধেক।

৪. শ্রমিক অভিবাসন বেড়ে চলছে। বিশ্বে এখন সাড়ে আট কোটি অভিবাসী শ্রমিক রয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে তিন কোটি উন্নয়নশীল অঞ্চলসমূহের।

৫. বৈশ্বিক অর্থনীতির অগ্রগতি ভালো কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছে ফলে তা দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা রাখছে কম।

যোগাযোগের ঠিকানা :
বাড়ি নং- ২০ সড়ক নং- ১১ (নতুন) ৩২ (পুরাতন)
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা- ১২০৯

ফোন: ৮১২৩৮৬৯, ৮১২৩৮৭০, ৯১৪৩২৩৬
ফ্যাক্স: ৮১১৪৮২০
ই-মেইল: bils@citech.net
ওয়েব পেজ: www.bils-bd.org